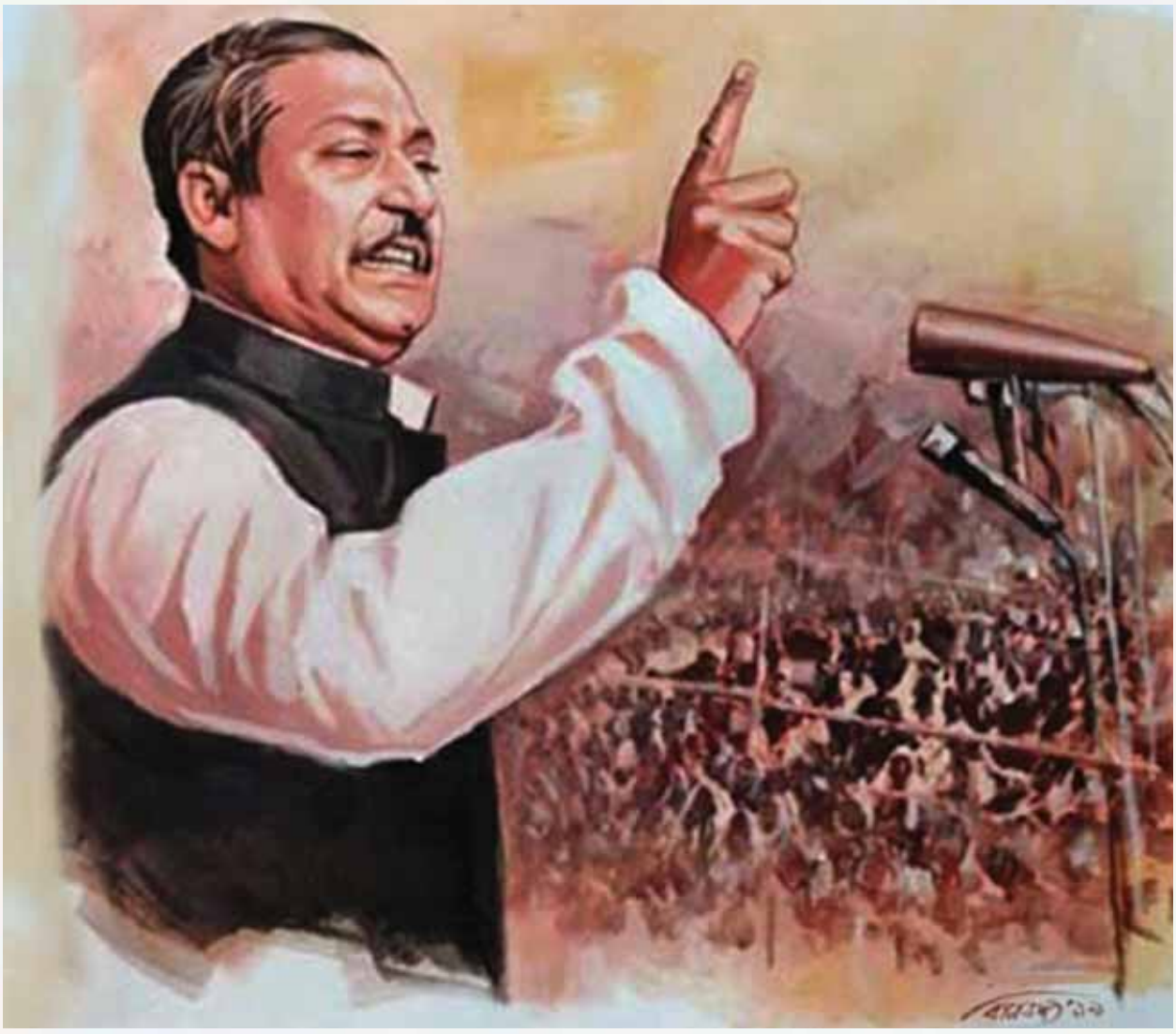

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের

প্রভাষ আমিন

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণটি আমি কতবার শুনেছি, তার ইয়ত্তা নেই। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে যতবার শুনেছি, আগে শুনেছি তারচেয়ে বেশি। যতবার শুনি, ততবারই আমি শিহরিত হই, অনুপ্রাণিত হই, বারবার আমি ৭ই মার্চের ভাষণ থেকে শিখি। এখনও যতবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যাই, আমি অনুভব করার চেষ্টা করি, সেদিনের ৭ই মার্চের পরিস্থিতি। তবে ইদানীং ৭ই মার্চ, ১৫ই আগস্ট, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বরের মতো দিনগুলো এলে আমি ভয়ে ভয়ে থাকি। চারদিকে এমনভাবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজতে থাকে, নিজেকে গুটিয়ে রাখি; পাছে অবচেতন মনে ভাষণটির প্রতি বিরক্তি চলে আসে। যারা বাজান তারা যদি বিষয়টি মাথায় রাখেন ভালো হয়।

বঙ্গবন্ধু কবি নন, একজন রাজনীতিবিদ। কিন্তু ৭ই মার্চের সেই বিকেলে তিনি যেন হয়ে উঠেছিলেন শ্রেষ্ঠ এক কবি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ কাব্য নয়, মহাকাব্য। মাত্র ১৮ মিনিটের ভাষণে এক হাজার ৮৬ শব্দে একটি জাতির ২৩ বছরের বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরা যায়, একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা যায়; বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। ভাষণে বঙ্গবন্ধু মানুষ যা শুনতে চায়, তার সবই বলেছেন; কিন্তু পাকিস্তানীরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদীর অভিযোগ আনতে পারেনি। উত্তাল জনসমুদ্রে, তুঙ্গস্পর্শী আবেগের সাথে পরিমিতির এমন মিশেল সত্যিই বিরল। কোনো লিখিত স্ক্রিপ্ট ছাড়া এমন একটি মহাকাব্য লেখা সম্ভব? শুনলে মনে হবে, একটুও মেদ নেই, একটিও বাড়তি শব্দ নেই। অথচ কোনো না বলা কথা নেই। সব দাবি উঠে এসেছে নিপুণভাবে, সব আবেগ উঠে এসেছে দারুণভাবে। দাবি আছে, হুমকি আছে। বঙ্গবন্ধু বলেছেন হৃদয় থেকে, কিন্তু তাতে বিবেচনার অসাধারণ মিশেল।

এখন যখন আমরা ভাষণটি শুনি, মনে হতে পারে, এ আর এমন কী? কিন্তু ভাবুন একবার সেই ৭ই মার্চের কথা। ৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে আওয়ামী লীগ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কেউ পাকিস্তান শাসন করবে, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না পশ্চিমাদের পক্ষে। চলছিল নানা ষড়যন্ত্র, টালবাহানা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল

ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। সবাই আশায় বুক বাধে। কিন্তু ১ মার্চ এই অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করলে ফুঁসে ওঠে জনতা। বঙ্গবন্ধুর সামনে তখন স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। জনতার দাবি, ছাত্রনেতাদের চাপ, সিনিয়র নেতাদের ভিন্নমত - সবমিলিয়ে বঙ্গবন্ধু তখন চিড়ে-চ্যাপ্টা। বেগম মুজিব বলে দিলেন, তোমার হৃদয় যা বলবে, তুমি তাই বলবে। বঙ্গবন্ধুর জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় ছিল জনতার আবেগের সাথে সুর মিলিয়ে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাতে কী হতো? হয়তো সাথে সাথেই ঝাঁপিয়ে পড়তো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী। সেদিনই রক্তগঙ্গা বয়ে যেতে পারতো রেসকোর্স ময়দানে। সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে আসা আমাদের মুক্তির সংগ্রাম বিশ্বে পরিচিতি পেতে পারতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা বঙ্গবন্ধু হয়ে যেতে পারতেন বিচ্ছিন্নতাবাদী। আবার স্বাধীনতার কথা বলা ছাড়া সেদিনের রেসকোর্সের লাখো মানুষকে ঘরে ফেরানো কঠিন ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণ শেষ করলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বুদ্ধিমত্তার কী অসাধারণ প্রয়োগ! সবই বলে দিলেন। কিন্তু পাকিস্তানীদের উপায় ছিল না তাকে ধরার। শত উস্কানি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু দারুণ সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। আসলে তখন একটা দারুণ কৌশলের খেলা চলছিল। আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করছিল পশ্চিমারা। চলছিল অস্ত্র ও সৈন্য সমাবেশ। কিন্তু বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করলেন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আক্রমণের জন্য। ২৫ মার্চের মধ্যরাতে অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে পাকিস্তান হলো হামলাকারী আর স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বঙ্গবন্ধু হলেন স্বাধীনতাকামী নেতা।

৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে মজার গল্প বলেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গিয়েছিলেন এক বিদেশি সাংবাদিকের দোভাষি হিসেবে। সেই সুবাদে মঞ্চের খুব কাছে বসার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। ভাষণের শুরুতে তিনি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ অনুবাদ করার চেষ্টা করলে সেই সাংবাদিক তাকে ইশারায় থামিয়ে দেন। পরে সেই সাংবাদিক তাকে বলেছেন, অনুবাদ করার দরকার নেই। বঙ্গবন্ধু কী বলেছেন, তা হয়তো বোঝেননি সেই সাংবাদিক। তবে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আবেগটা ধরতে তার কোনোই অসুবিধা হয়নি।

এত বড় আন্দোলনেও বঙ্গবন্ধু গরীব মানুষের কথা ভোলেননি। তিনি বলেছেন, 'গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন, আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন।' বঙ্গবন্ধু কতটা মানবিক, ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, শুনুন তা কণ্ঠেই, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই; বাঙালি, অ-বাঙালি তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।' এক কথায় তিনি বলে দিয়েছেন তার রাজনীতির দর্শন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই।'

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু বাঙালির সম্পদ বা বাংলাদেশের সম্পদ নয়। ইউনেস্কো এই ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য দলিলের স্বীকৃতি দিয়েছে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতির আগেও ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এফ ফিল্ড গত আড়াই হাজার বছরের সেরা ভাষণ নিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাতেও ঠাঁই পেয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণ।

আসলে ৭ই মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু তাঁর সারাজীবনের রাজনৈতিক দর্শনটাই তুলে এনেছেন অল্প কথায়। গণতন্ত্রের প্রতি, নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি, দুখি মানুষের প্রতি তার দরদটা টের পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনে গণতন্ত্র সম্পর্কে আমার ধারণাই বদলে গেছে। আমি এখন সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণতন্ত্র নয়, ন্যায্যতার গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। আর ন্যায্যতার গণতন্ত্রের শেষ কথা মানি বঙ্গবন্ধুর ভাষণকেই 'আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো - এমনকি আমি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' এই যে ভিন্নমতের প্রতি বঙ্গবন্ধুর শ্রদ্ধা, এটার চর্চা কি আমরা এখন করি? আজ যদি বিএনপি নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাজিয়ে বলে, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়' খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না কিন্তু।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তাঁর কন্যার হাত ধরে চলছে অর্থনৈতিক মুক্তির লড়াই। ৫১ বছর বয়সে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের এবারের সংগ্রাম উন্নয়নের, এবারের সংগ্রাম সমৃদ্ধির, এবারের সংগ্রাম মুক্তির। বলা হয়, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন। একই কথা খাটে উন্নয়নের ক্ষেত্রেও। উন্নয়নটা যেমন জরুরি, তারচেয়ে বেশি জরুরি টেকসই উন্নয়ন। উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়াটা যতটা গর্বের, ততটাই চ্যালেঞ্জের। বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে। সুশাসন দিয়ে, সৃষ্টিশীলতা দিয়েই সেই বাধা টপকাতে হবে। আর উন্নয়ন মানে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, টেকসই উন্নয়ন মানে মানুষের জীবনমানের সামগ্রিক উন্নয়ন। শুধু অর্থনৈতিক সূচকে উন্নয়ন হলেই হবে না; গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, মানবাধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা - সব সূচকেই উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা পেয়েছি; তাঁর কন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরেই আসুক সামগ্রিক মুক্তি। আর মুক্তি মানে বৈষম্য থেকে মুক্তি, চিন্তার মুক্তি, সাম্প্রদায়িক চিন্তা থেকে মুক্তি।

অনেকে অনেকভাবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ নিয়ে অনেক কথা বলেন। অনেক গবেষণা হয়েছে। অনেক লেখা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক কবি নির্মলেন্দু গুণ সেই বিকেলের ছবি এঁকেছেন সবচেয়ে নিপুণভাবে -

'সেদিন এই উদ্যানের রূপ ছিল ভিন্নতর।
না পার্ক না ফুলের বাগান, এসবের কিছুই ছিল না,
শুধু একখণ্ড অখণ্ড আকাশ যেরকম, সেরকম দিগন্ত প্লাবিত
ধু ধু মাঠ ছিল দুর্বাদলে ঢাকা, সবুজে সবুজময়।
আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় প্রাণের সবুজ এসে মিশেছিল
এই ধু ধু মাঠের সবুজে।'

কারা এসেছিলেন সেদিনের সেই সমাবেশে? এই প্রশ্নের উত্তরও লেখা আছে নির্মলেন্দু গুণের কবিতায় -

'কপালে কব্জিতে লালসালু বেঁধে
এই মাঠে ছুটে এসেছিল কারখানা থেকে লোহার শ্রমিক,
লাঙল জোয়াল কাঁধে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে উলঙ্গ কৃষক,
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এসেছিল প্রদীপ্ত যুবক।
হাতের মুঠোয় মৃত্যু, চোখে স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল মধ্যবিত্ত,
নিম্ন মধ্যবিত্ত, করুণ কেরানি, নারী, বৃদ্ধ, বেশ্যা, ভবঘুরে
আর তোমাদের মতো শিশু পাতা-কুড়ানিরা দল বেঁধে।'

সেই সমাবেশে বঙ্গবন্ধুর আসা, তার আগের সময়কার অনেক বর্ণনা আছে ইতিহাসে। তবে গুণদার মতো করে আর কে বোঝাতে পেরেছিলেন সেই সময়কার ছবিটি? আবারও নির্মলেন্দু গুণের কাছে হাত পাতি -

'একটি কবিতা পড়া হবে, তার জন্য কী ব্যাকুল
প্রতীক্ষা মানুষের: 'কখন আসবে কবি?' 'কখন আসবে কবি?'
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল
হৃদয়ে লাগিল দোলা, জন সমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?'

স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে অনেকে অনেক বিতর্ক করেন। ভুল মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান কৃতিত্বের বোঝা। এখানে আসলে বিতর্কের কিছু নেই। কিন্তু নির্মলেন্দু গুণের কবিতা দিয়ে লেখা শেষ করি -

"গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর-কবিতাখানি
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।"

প্রভাষ আমিন, *হেড অব নিউজ, এটিএন নিউজ*